বাঙলা ভাষার অবস্থান

হিতেন ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ও প্রশাসনে বাঙলা ভাষার অবস্থান

‘‘ত্রিশ, পঞ্চাশ, একশো, হাজার। তিন হাজার বছর কাটিয়া যাইবে--- তখন এ গ্রাম লুপ্ত রাজনৈতিক অবস্থা– যাদের বিষয় এখন কল্পনা করিতেও সাহস করে না, তখন আসিবে জগতে! ইংরেজ জাতির কথা প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইবে, বর্তমান বাংলা ভাষাকে তখনো হয়তো আর কেহ বুঝিবে না, একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়া সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ভাষা এদেশে প্রচলিত হইবে।’’ (অপরাজিত (চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ), বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

।। এক ।।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ও প্রসাসনে বাঙলা ভাষার অবস্থান বিষয়ক আলোচনা অতীব সংবেদনশীল। ভারতবর্ষের মতো একটি উত্তর - উপনিবেশিক বহু ভাষিক বহুজাতিক বহু ধর্মাশ্রয়ী মানুষের দেশে কোনো একটি রাজ্যের শিক্ষা ও প্রশাসনে সেই রাজ্যের প্রধান ভাষাটির অবস্থান বিষয়ক আলোচনা নানা কারণেই জটিল ও পরস্পর বিরোধীচিন্তায় আক্রান্ত।

স্বাধীনতার অনেক আগেই মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক বঙ্গদেশে একটি মেট্রোপলিটন মানসিকতা ও মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। রামমোহন - বিদ্যাসাগরে যার সূত্রপাত ও রবীন্দ্রনাথে যার পরিণতি। আবার ক্লাইভের আমল থেকেই ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্নায়ুকেন্দ্রও এই কলকাতা। বন্দর, ঝিবিদ্যালয়, ব্রিটিশ আমলের প্রথম রাজধানী, বাবু, কেরানি, আমলা, অধ্যাপক, চিকিৎসক, যন্ত্রবিদ, বাস্তুকার অর্থাৎ প্রাথমিক পর্বে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষায় বাঙালির অবদান ছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রধান অবলম্বন। আর এসবই সম্ভব হয়েছিল ইংরজীভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে বাঙালির অবাধ অধিকারের ফলে।

অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন উপলক্ষ্যে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সূচনাও বাঙালির হাতে। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ ও রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ বাঙালির জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়মুক্তি চেতনার দুই বিপরীত মের উচ্চারণ হয়েও একান্ত আপন স্বর। মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ যেমন, ঠিক তেমনি সুরেন্দ্রনাথ থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত আমরা আগে ভারতীয় তার পরে বাঙালি। আবার ভারতীয় অথবা বাঙালি, উভয় অস্তিত্বেই আমরা পৌঁছোই ইউরোপের হাত ধরে। আমাদেরর জাতীয়তাবোধের ধারণা ইউরোপের কাছ থেকে ধার করা। এমনকি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সমস্ত ধারাগুলোই নীতি ও কৌশলের দিক দিয়ে ইউরোপীয় মতাদর্শে জারিত। একমাত্র গান্ধিজী তাঁর অহিংসার দর্শন যে উৎস থেকেই গ্রহণ করে থাকুন না কেন, তাঁর সমস্ত কার্যক্রমকে যথাসম্ভব ভারতীয়ত্ব কিন্তু আমাদের রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তথাকথিত বাঙালি নবজাগরণের আদলে তৈরি ভারতীয়ত্ব নয়। তিনি হিন্দুস্তানের একেবারে নিচের তলার যে মানুষের কথা একদা বিকেকানন্দ বলেছিলেন, তাঁদেরই তুলেআনতে চেয়েছিলেন তাঁর সংগ্রামের সামনের সারিতে।

তথাকথিত নবজাগরণের প্রভাবে আচ্ছন্ন বাঙালি বিদ্যাসাগরকে তাঁর জীবিতকালেই বিসর্জন দিয়েছিল। বাঙালির কাছে জাতি গঠনের থেকে দেশের স্বাধীনতার আবেশ অনেক বড় বলে মনে হওয়ার শিকার তিনি। তিনি আমাদের আধুনিক ইতিহাসের প্রথম ট্র্যাজিক নায়ক। দ্বিতীয়জন অবশ্যই গান্ধিজী। বাঙালি গান্ধিজীকে প্রথম াবধি গ্রহণ করেনি। গ্যারিবল্ডি, মাটসিনির মতো নায়ক চেয়েছে বাঙালি, তাই শরৎচন্দ্রে ‘পথের দাবী’ সতীনাথেৰ ‘জাগরী’রথেকে অনেক বেশি জনপ্রিয় বাঙালির কাছে।

বাঙালির জাতীয় চরিত্রে এক গভীর অন্তর্ঘাতের সূচনা উপনিবেশ পত্তনের শু থেকে। ইংরেজী শিক্ষার প্রকোপে, উপনিবেশের কল্যাণে সৃষ্ট অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্যে ও নবজাগরণের প্রবল অভিঘাতে বাঙালি তার ভাষা ও সাহিত্যে সঙ্গীত নৃত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় মধ্যযুগের উত্তরাধিকার থেকে শিকড়শুদ্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সচেতনভাবেই এই বিচ্ছিন্নতা বাঙালি চেয়েছিল বলেই ইংরেজ - পূর্ব যুগকে ‘মধ্যযুগ’ নামক অসদর্থক নামকরণে আখ্যাত করা হয়েছে, আমরা তা মেনেও নিয়েছি। মঙ্গলকাব্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, চৈতন্য চরিতামৃত এই মধ্যযুগের সাহিত্য, জয়দেবও চণ্ডীদাস এই যুগের কবি এবং স্বয়ং চৈতন্যদেব এই যুগের পরমপুষ। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালি এই উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শু করে। ফলে বাঙালি পণ্ডিত গবেষকদের একটা মজার খেলা হল কোন কোন বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক বা গল্প লেখক কোন কোন ইংরেজ ফরাসী বা জর্মন কবি বা লেখকের দ্বারা প্রভাবিত তা খুঁজে বের করা। ইদানিং আমেরিকান, লাটিন আমেরিকান বা আফ্রিকান লেখকদের প্রভাবও খুঁজে বের করা হচ্ছে। এই আক্রমণাত্মক সমালোচনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তো বটেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও রক্ষা পাননি। অথচ ভারতবর্ষের মতো একটি ঔপনিবেশিক দেশে, বিশেষ করে বাঙলা দেশে, যেখানে উপনিবেশের গোড়াপত্তনহয়েছিল, সেখানে তো এরকমই হওয়ার কথা ছিল। আফ্রিকান সাহিত্যের অধিকাংশটাই তো ইংরেজী ভাষায় লেখা। পল রবসন তো নিজের দেশের গান ও ভাষা শেখার প্রেরণা পান লন্ডনে পড়তে এসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আত্মজীবনী Where I stand ইংরেজী ভাষাতেই লেখা। ইদানিং যে বাঙালি লেখকরা ইংরেজী ভাষার গল্প উপন্যাস লিখছেন, বহুল পঠিত কিনা এই সন্দেহ মনে রেখেও স্বীকার করতেই হয় যে এরাই এখন জনপ্রিয় বাঙালি লেখক।

বাঙালি পাঠকের কাছে ‘জনপ্রিয় লেখক’ কথাটা গোলমেলে। তিনজন জনপ্রিয় লেখকের কথাই ধরা যাক। তাঁরা যথাক্রমে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও দেবেশ রায়। খুব সাধারণ ভাবে নেওয়া জনমতের রায় এরকম--- যাঁরা এখনো শরৎচন্দ্র পড়েন তাঁরা সুনীলের নাম জানেন, কিছু কিছু লেখাও পড়েছেন। কিন্তু প্রায় কেউই জানেননা যে সুনীল কবি, যদিও এই লেখকের মতে কবিতাই সুনীলের বড় মাপের পরিচয় বহন করে। দেবেশ রায় তাঁদের কাছে একেবারেই

অপরিচিত নাম। যাঁরা সুনীলের গল্প - উপন্যাস নিয়মিত পড়েন তাঁরা একদা শরৎচন্দ্রপড়েছেন। এখন পড়েন না। তাঁদের একাংশ দেবেশের লেখা পড়েন, কেউ কেউ পড়তে আরম্ভ করে শেষ করতে পারেন নি সে কথাও কবুল করেন। আর যাঁরা দেবেশের লেখা নিয়মিত পড়েন, শরৎচন্দ্রের লেখা ফিরে পড়ার সময় তাঁদের নেই। সুনীলের লেখা পড়ার আগ্রহ বোধ করেন না তাঁরা। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট গল্প বলি। আলোচনা প্রসঙ্গেএকজন শিক্ষক বন্ধুকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি বুদ্ধদেব বসুর লেখা পড়েছেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, পড়েছি, কিন্তু আপনি ভুল করেছেন, বুদ্ধদেব বসু নয়, গুহ।' অথচ আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ ও অতুল গুপ্ত ছাড়া এমনভালো বাঙলা প্রবন্ধ আর কেউ লিখেছেন বলে আমি জানি না।

আমি আগেই বলেছি উপনিবেশের সূচনা পর্বেই বাঙালি সংস্কৃতির ভিতে কিছু অন্তর্ঘাত ঢুকে গিয়েছিল। প্রথমত, ইংরেজ-পূর্ব বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃতি, সঙ্গীতের যে উত্তরাধিকার আমাদের ছিল তা থেকে আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলাম ও রামমোহন থেকে যে যুগের সূচনা তাকে নবযুগ ও নবজাগরণ অভিধায় চিহ্নিত করে অহংকৃত হয়েছি। এমনকি এতকাল বাদে এই বঙ্গে বাঙলা ভাষাকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্যে একদল বুদ্ধিজীবী নব - জাগরণের ডাক দিয়েছেন। প্রশাসন ও শিক্ষায়, ব্যবহারিক নিত্যকর্মে বাঙালা ভাষার চলন প্রতিষ্ঠার দাবি করেছেন। এই প্রসঙ্গে পরে আসব। আপাতত এইটুকু বুঝে নেওয়া জরি যে আমরা কোনোদিনই আর আমাদের শিকড়ে পৌছতে পারব না। না ভাষায়, না সংস্কৃতিতে।

দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দী থেকেই যে মধ্যবিত্ত ইংরেজী শিক্ষিত এলিট সম্প্রদায় বঙ্গের শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসন ও সামাজিক - রাজনৈতিক আধিপত্যে অবস্থান করেছেন, ইংরেজী তাঁদের চিন্তন ও বাচনের প্রধান অবলম্বন যেমন, ঠিক তেমনি কর্মক্ষেত্রেও তাঁরা ইংরেজীর আশ্রয় ছাড়া স্বাভাবিক বোধ করেন না। ফলে বাঙলা ভাষা যেহেতু অসম্ভব নমনীয় ও শক্তিশালী তাই নিরন্তর ইংরেজীর সাহচর্যে ভাষার গড়ন, শব্দভাণ্ডার ও প্রকাশশক্তি নিরন্তর বদলে যাচ্ছে সম্প্রসারিত হচ্ছে, জটিল হচ্ছে। আর এই নিরন্তর পরিবর্তন বাঙলা ভাষাকে ক্রমান্বয়ে সংখ্যালঘুর ভাষায়পরিণত করেছে। এই বঙ্গেই স্বাধীনতা উত্তর কালে আধুনিক শিক্ষার সম্প্রসারণ যেহেতু করা যায়নি তাই এমন স্নাতকও সহজলভ্য, যাঁরা বাঙলা বই পড়ে অর্থোদ্ধারে অক্ষমতা প্রকাশ করেন, বা আদৌ বাঙলা বই পড়েন না। তার মানে এই নয় যে তাঁরা ইংরেজী বই পড়েন।

এই বাস্তব পরিস্থিতির কথা মনে রেখেই আমি এই রাজ্যের প্রশাসন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষার অবস্থান বিষয়ে প্রবেশ করছি।

।। দুই ।।

পশ্চিমবঙ্গে বাঙলা ভাষা ভারতবর্ষের ১৬৫টি মাতৃভাষার একটি। তার মধ্যে যে ৬৭টি ভাষাকে বিদ্যালয় স্তরে মাতৃভাষা হিসেবে পড়ানো হয় বাঙলা তার মধ্যেও একটি। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরেও রাজ্যের সরকারি স্তরে ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে বাঙলার যে গুত্ব পাওয়ার কথা ছিল আমরা তা দিতে পারিনি। প্রতিবেশী বাংলাদেশে বাঙলা রাষ্ট্র ভাষা বিধায় সে দেশে বাঙলা ভাষার ব্যবহারিক দক্ষতা ও মর্যাদা অনেক বেশি। তার জন্য বাঙলাদেশকে ইংরেজী চর্চা কেটে ছেঁটে নামিয়ে আনতে হয়নি।

কিন্তু আমাদের মুশকিল হচ্ছে, আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি, আমরা তা মানিনা, শ্রদ্ধেয় সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ সত্ত্বেও আমরা তা মানিনা। স্বাধীনতা - উত্তর কালে আমরা আর প্রথমে ভারতীয় নই। আমরা এখন প্রথমও শেষেও বাঙালি, সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষা হিসেবে আমরা এখন তাই ইংরেজীকেই আঁকড়ে ধরেছি। গত ১৬ নভেম্বর ২০০১ তারিখে অন্তঃরাজ্য পরিষদে, ভাষা বিষয়ক আলোচনা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ইংরেজীকেই ভারতবর্ষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম করার দাবি জানিয়েছেন। দক্ষিনের হিন্দি বিরোধী রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিরা এতে খুশি হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী জোটের রাজনীতি ভারতে ব্যবহারিক ভাষার প্রশ্ন সেঁধিয়ে গিয়ে অন্যতর জটিলতার প্রশ্রয় দিচ্ছে কিনা বুদ্ধদেব তা ভেবে দেখেন নি। উপযোগিতার দোহাই দিয়ে বিচ্ছিন্নতার রাজনীতির বীজ এভাবেই বুনে যাচ্ছি আমরা।

ইংরেজীর প্রতি এই নির্ভরতা শুধু রাজনীতির জন্যেই নয়। এ আমাদের মজ্জার মধ্যেও ঢুকে আছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে বাঙলা ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদাও আমরা দিতে পারিনি। সরকারি ভাবে চেষ্টা হয়নি এমন অন্যায় অভিযোগ করা যাবে না। কারণ, বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার আগে অন্তত তিনবার, ১৯৪৭, ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে রাজ্য সরকার বাঙলাকে রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৬১ সালে বিধান সভায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাব অনুমোদন পায়। ১৯৬৪ সালে সরকারি কাজের জন্য বাঙলা ভাষা আইন প্রণয়নের জন্যে ল কমিশনও গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নামে দুবার যথাক্রমে ১৯৮১ সালের ১৫ মে ও ২০০০ সালের ১৪ এপ্রিল বাঙলা ভাষাকে সরকারি কাজের সর্বস্তরে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এতসব করেও ইংরেজী আনুগত্য থেকে বাঙালিকে নড়ানো যায়নি। ডাঃ বিধান রায়েব আমলে রাইটার্সে সরকারি শিক্ষাবিভাগে সাত বছর চাকরি করেছিলাম। দেখেছিলাম ভালো ইংরেজী লেখার প্রতিযোগিতা ছিল কেরানিকুলে। অসম্ভব ভালো ইংরেজী লিখতে পারতেন এমন চাকুরের সংখ্যাও কম ছিল ন।। আর ছিল তাঁদের কদর।তারই মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৬০ - ৬১ সালে শান্তিনিকেতনের বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ অমিয় সেন বিশেষ আধিকারিক হিসেবে শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন। অমিয়বাবু একক প্রচেষ্টায় সরকারি ফাইলে নির্দেশাদি বাঙলায় লিখতে শু করলেন।তাঁর মুক্তাক্ষরে লেখা সেই সব ফাইল হয়তো আজও খুঁজে পাওয়া যাবে। বিশেষ করে রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম সরকারি সংস্করণের ফাইলগুলো। নিতান্তই আমার মতো একজন অধম করণিক সেই সব ফাইলে বাঙলায় জবাব লেখার চেষ্টা করে প্রধান করণিক আর মাঝারি সাহেবদের কাছে তিরস্কৃত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।

সেই অবস্থার কোনও পরিবর্তন আজও হয়নি। আমি ব্লক ও পঞ্চায়েত অফিসেও দেখেছি আকাট ভুল ইংরেজীতে চিঠিপত্র লেখা হয় ও তাতে বেশ কাজ চলে যায়। যাঁরা এই চিঠি পত্র লেখেন সেই বঙ্গ সন্তানেরা আকাট ভুল বাঙলাতেও কাজ চলার মতো ঐ চিঠি লিখতে পারেন না।

আসলে বিসমিল্লার গলদ। সাহেবরা আমাদের কেরানি বানানোর জন্যে ইংরেজী শিখিয়েছেন। আমরা সেজন্যে সাহেবদের দোষ দিই। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সাজানোর দায়িত্ব যখন আমাদের হাতে এল আমরা তখন বাঙালিকে কেরানি বানানোর জনে বাঙলা শেখাতে পারলাম না। ফলে কি হল আমরা ভেবে দেখিনা। এই গোটারাজ্যে এমন একজন যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক পাওয়া যাবে কী যিনি বাঙলায় ব্যবস্থাপত্র লেখেন? স্কুল কলেজে শিক্ষকরা, বাঙলার শিক্ষকরাও শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ডাকেন ইংরেজী সংখ্যা দিয়ে। উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, পরিসংখ্যান বিদ্যা বা অর্থনীতি কি ইংরেজী না জেনে চর্চা করা সম্ভব? কিন্তু এইসব প্রশ্ন আমাদের শিক্ষা চিন্তাকদের ভাবায় না।

।। তিন ।।

পঞ্চাশের দশকের শেষে দিকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বাঙলা ভাষা চালু করার দাবি নিয়ে প্রায় একক যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, একের পর এক বিতর্ক সভায় সেই দাবি নিয়ে যুক্তি সাজাতেন আবেদন করতেন, তখন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটা ব;ন অংশই তাঁর বিদ্ধ পক্ষে যোগ দিতেন। বিদ্ধ পক্ষেরঅন্যতম নায়ক ছিলেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত। কবি বুদ্ধদেব বসু প্রথম দিকে বিদ্ধ পক্ষে থেকেও পরে আচার্য বসুর পক্ষে সামিল হয়েছিলেন। সদ্য জাপান ভ্রমণে গিয়ে সেখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পড়াশোনার চলন দেখে তাঁর ধারণা বদলেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু কিন্তু বাঙলা ভাষার পক্ষে বলতে গিয়ে কখনো ইংরেজী ভাষার বিদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। ইংরেজী চর্চার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে, পেশাদার শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙলাভাষার প্রচলন যে জরি আর তাই যে বাঙালির জীবনে বাঙলা ভাষার গুত্ব বৃদ্ধির একমাত্র উপায়, এটাই ছিল তাঁর প্রতিপাদ্য। আমার স্মৃতি যদি বয়সের কারণে আমার বিদ্ধাচরণ না করে

তাহলে একমাত্র অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত ছাড়া সমকালীন বামপন্থী নেতাদের কাউকে আমি আচার্য বসুর পাশে দাঁড়াতে দেখিনি।

ইতিমধ্যে গঙ্গায় অনেক জল গড়িয়ে গেছে। আমরা স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, বিশ্বায়নের উদ্যোগে সামিল হয়েছি। পেশাদারিত্ব ও প্রতিযোগিতা এখন আমাদের গীতা- কোরান-বাইবেল। একথা এখন উল্লেখের অপেক্ষা রাখেনা যে ইংরেজী এখন আর ইংরেজের ভাষা নয়। এমনকি শেকস্‌পীয়র, বায়রণ বা এলিয়ট এরও ভাষা নয়। ইংরেজী এখন পৃথিবী জুড়ে সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে জরি কাজের ভাষা। আর সর্বত্রই মানুষ এখন তার প্রদেশ বা দেশের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বনাগরিক হতে আগ্রহী। পশ্চিমবঙ্গেও ইংরজীর প্রতাপ ক্রমান্বয়ে বাড়বে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ইংরেজী ভাষায় যাঁরা নিত্যদিন সচ্ছন্দে কাজকর্ম করছেন তাঁরা কেউ অবসর সময়ে অমিতাভ ঘোষের উপন্যাস পড়ছেন না।

বিপরীতে বাঙালাকে আমরা সাহিত্যের ভাষার উচ্চাসন থেকে নামিয়ে কাজের ভাষায় বদলে নিতে চাইনি। সাহিত্য ও সাহিত্যের ভাষা যে ক্রমেই সংখ্যালঘুর ভাষায় পরিণত হচ্ছে তা দেখেও আমরা চোখ বুজে আছি। আমাদের স্কুল - কলেজ বাঙালার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাঙলা পাঠ্যসূচীর বিবর্ণ অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় ছাত্র - ছাত্রীদের সঙ্গে বাঙলা ভাষার সম্পর্ক কী। দীর্ঘ ৩২ বছর ইংরেজী শিক্ষকতার সুবাদে আমার অভিজ্ঞতায় বলে, ইংরেজী নয়, বাঙলাই ছাত্র - ছাত্রীদের বোঝা, অবহেলার পাঠ্য। কারণ পরীক্ষায় পাশ করার পর এই বিদ্যা কোনো কাজেই লাগে না। পেশাদার মনোভাব এখন স্কুল ছাত্রদের মধ্যেও চারিয়ে যাচ্ছে । বিজ্ঞানের সাথে ইংরেজীও তাদের পড়তেহবে, এই মনোভাব তাদের আছে। কিন্তু বাঙলার বোঝা কেন টানছে এটাই তারা বুঝতে চায়না।

আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীর পাঠ্যসূচী কেজো - ইংরেজীর উপর জোর দিয়ে তৈরিহয়েছে। কিন্তু বাঙলা পাঠ্যসূচীর জোর সাহিত্যের উপর। সাহিত্য যে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে সংখ্যালঘুর, এই দুঃখজনক সত্যকে অস্বীকার করার উপায় আর নেই। আর যাঁরা সাহিত্য পড়রেনই তাঁরা আপন তাগিদেই পড়বেন। কিন্তু জীবিকার সাথে, জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সাথে, অর্থোপার্জনের নানান বিচিত্র কৌশলের সাথে বাঙলা ভাষার ব্যবহারিক যোগ স্থাপনের জরি কাজটি নিয়ে আমাদের কোনও পরিকল্পনা তৈরি হয়নি। বাঙলা ভাষা আমাদের জীবনে ফুল হয়ে বিরাজ কক। কিন্তু কখনোই যেন হাতের লাঠি না হয়, এরকমই আমাদের নিঃশব্দ সিদ্ধান্ত।

বাঙলা ভাষার সম্মান ও গুত্ব পুনর্জ্জীবনের জন্যে নব - নবজাগরণবাদীদের আগ্রহ মান্য। কিন্তু তাঁদেরকার্যক্রম হাস্যকর। মাঝে মাঝে সন্দেহজনক। এরাজ্যর বামপন্থীদের মধ্যে বাঙালি প্রাদেশিকতাকে খুঁচিয়ে তোলার একটা ঝোঁক ছিলই। গত নির্বাচনের আগে নব-নবজাগরণবাদীরা যেভাবে নগরে সভা করছিলেন, সেই সভায় এক তরফা বক্তব্য রাখছিলেন ও সভার শ্রোতাদের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল একটা আবেগ উস্কে দেওয়াই ঐ সব সভার লক্ষ্য ছিল। কলকাতায় ও অন্যত্র দোকানের সাইনবোর্ডগুলো বাঙলায় লিখলেই বাঙলা ভাষা উদ্ধার পাবে— এহেন 'আমরা বাঙালী' জাতীয় স্লোগানে মানুষ ভোলে না। আর সরকারি কাজে বাঙলা ভাষা ব্যবহারেরজন্য তো মিটিং - মিছিলের প্রয়োজন নেই। জনপ্রিয় সাংবাদিক - সাহিত্যিকেরা তো জনপ্রিয় মন্ত্রীদের সাথে বসে আলোচনা করেই সে সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কেউ তো বাধা দিচ্ছে না। নির্বাচনের পর অবশ্য নব - নবজাগরণবাদীদের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। তাতেই মনে হয় ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ বাঙালিকে শিকড় ছিন্ন করেছিল, দেশভাগ দ্বিতীয় বার বাঙালিকে ছিন্নমূল করে। এই বঙ্গের বাঙলা এখন এক গভীর অনিকেত মানসিকতায় আক্রান্ত। উন্নয়ন, পরিবর্তন, উত্তর আধুনিকবাগবিভূতি ও চাকচিক্যময় 'ব্যবহার কর ও ফেলে দাও' মার্কা ভোগ্যপণ্যের লালনে বাঙালি এখন আত্মবিস্মৃত। ভাষানিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই। নিতান্তই শৌখিন কিছু ভাষাজীবীকে মাঝে মাঝে এ ধরনের আওয়াজ তুলতেই হয়।তাই তোলা হয়। ভাষার নীতি রাজ্যর নীতি যে সম্পূর্ণ আলাদা তা আলোচনার ক্ষেত্র এই প্রবন্ধ নয়।

ভাষা তার নিজের নিয়মে চলে। তার শর্ত সেই ভাষাভাষীদের জীবন যাপনের উত্থান পতন ও নিত্য পরিবর্তনের সাথে বাঁধা। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতাত্ত্বিক যেমন তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না তেমনি কোনো গোষ্ঠিদল বা সরকারও তা করতে পারেন না। বাঙালির জীবন যাপন মাত্র তিরিশ বছর আগের বাঙালির মতো নেই এবং আগামী সময়ে তা আরো দ্রুত বদলে যাবে। কাজের ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষাকে বাঙালি আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরবে। বাঙলা ক্রমেই হয়ে পড়বে দ্বিমাত্রিক ভাষা। এক মাত্রায় তা অত্যন্ত জটিল, ইংরেজীর আদলে তৈরি বাঙলা, বা শিক্ষিত ধনী মধ্যবিত্তের একাংশের অবসর যাপনের ভাষা। অন্য মাত্রায় অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বৃহৎ জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবন যাপনের ভাষা। কিন্তু বাঙলা কোনোদিনই বাঙালির কাজের ভাষা হয়ে উঠবে না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com